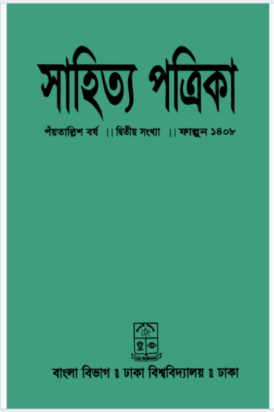

Vol. 45 | No. 2 | 2002

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আহমদ শরীফের দৃষ্টিতে ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ'

Volume	45
Issue	2
Year	2002
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	হাবিব রহমান
Published online	February 1, 2002
DOI	10.62328/sp.v45i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v45i2.5
Pages	126-144
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আহমদ শরীফের দৃষ্টিতে ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’

হাবিব রহমান*

গত শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে ঢাকায় ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’ নামের সংগঠনটির দ্বারা যে-বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন পরিচালিত হয় তাকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রক্ষণশীল গোঁড়ারা বরাবরের মতো একে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখেছেন। সংগঠনটির দুই পুরোধা ব্যক্তিত্ব কাজী আবদুল ওদুদ ও আবুল হুসেনের বিরুদ্ধে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষিতার অভিযোগ আনা হয়েছে, তাদের কোনো কোনো বক্তব্যকে বিবেচনা করা হয়েছে ইসলাম বিরুদ্ধ হিসেবে। অন্যদিকে যুক্তিশীল বিচার প্রবণ প্রগতিকামী শিক্ষিত মুসলমান একে দেখেছেন সদর্থক দৃষ্টিকোণ থেকে। তারা আশা করেছেন এ প্রতিষ্ঠানের দ্বারা মুসলিম সমাজের জড়তা কেটে যাবে, সমাজ-দেহে গতির সঞ্চার হবে। সাহিত্য সমাজ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পরে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মোতাহের হোসেন চৌধুরী লেখেন যে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন যদি সফল হতো তাহলে বাঙালি মুসলমানের জীবনে এ সোনা ফলাতে পারত।[১] পরবর্তীকালে আরো কেউ কেউ সাহিত্য সমাজের কর্মকাণ্ডকে একটি রেনেসাঁস আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তারা সকলেই উদার ও যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য-সমাজ-কথিত তাদের বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনকে বিচার করতে চেয়েছেন। কিন্তু মূলত একই দৃষ্টিকোণ থেকে হলেও সাহিত্য সমাজের ভিন্নরূপ মূল্যায়ন করেছেন চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক আহমদ শরীফ (১৯২১-৯৯)। বর্তমান প্রবন্ধে তার মূল্যায়নের স্বরূপ বিচার করাই আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু তার আগে এই আলোচনার স্বার্থে সাহিত্য সমাজের উদ্দেশ্য ও চিন্তা-দর্শন সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কথা বলে নেয়া দরকার।

১৯২৬ সালের জানুয়ারিতে ঢাকাকেন্দ্রিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় অধ্যাপক ও ছাত্রের মিলিত প্রয়াসে মুসলিম সাহিত্য সমাজ জন্ম নেয়। এর সঙ্গে সাহিত্য শব্দটি যুক্ত থাকলেও এটি গতানুগতিক ও মামুলি কোন সাহিত্য সংগঠন ছিল না। সাহিত্য শব্দটিকে এর সংগঠকরা একটি বৃহৎ অর্থে গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুত

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

সাহিত্যচর্চা তাদের কাছে ছিল জীবনচর্চার নামান্তর। আসলে তাদের মৌল উদ্দেশ্য ছিল মুক্তবুদ্ধির চর্চা করা। এজন্য নিজেদের কর্মকাণ্ডকে তারা অভিহিত করেছিলেন বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন নামে। সাহিত্য সমাজের বার্ষিক মুখপত্র 'শিখা'র টাইটেল পৃষ্ঠায় মুখবাণী হিসেবে যে-কথাটি ছাপা হতো— 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট মুক্তি সেখানে অসম্ভব'— তাতেই নিহিত রয়েছে তাদের লক্ষ্যের মর্মসার। বস্তুত এটিই ছিল তাদের জীবন-দর্শন। এই দর্শননির্ভর নিজেদের চিন্তা-উপলব্ধিকে তারা আন্দোলনের রূপ দিয়ে সমাজ-মানসে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন।

মুসলিম সাহিত্য সমাজের সঙ্গে 'মুসলিম' শব্দটি যুক্ত থাকলেও এটি কোন সম্প্রদায় বিশেষের সংগঠন ছিল না। তাই বহু হিন্দুও এই সংগঠনের সঙ্গে নানাভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। মূলত বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য রেখে 'মুসলিম' শব্দটি তারা ব্যবহার করেছিলেন। কেননা উদার চিন্তা ও মুক্তিবুদ্ধির প্রয়োজন সে-সময় মুসলমান সমাজের কাছে তুলে ধরা বিশেষভাবে দরকার ছিল। সে-কারণে সাহিত্য সমাজের লেখকেরা মুসলিম সম্প্রদায়ের সমস্যাদি নিয়ে ভেবেছেন ও সেগুলি সমাধানের পথনির্দেশনা দিতে চেষ্টা করেছেন; কিন্তু সাধারণভাবে তারা সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণ চিন্তাও করেছেন। মুসলমান সমাজের বিশেষ কোন সমস্যায় নয়, এর সর্বব্যাপী সমস্যা সম্বন্ধেই সাহিত্য সমাজের লেখকের বক্তব্য রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে আবদুল হক লিখেছেন :

> এর অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন, এর মনন ও আচরণ, এর কুসংস্কার, পরিবার-জীবন, সামাজিক প্রথা, গোঁড়ামি, অতীতমুখীনতা, পশ্চিমমুখীনতা, ললিতকলা বিমুখতা, শিক্ষা সমস্যা, কোন কিছুকেই 'সাহিত্য সমাজ' এড়িয়ে যেতে চান নি, সব কিছু সম্বন্ধে সমকালীন চিন্তাধারার গলদ তাঁরা উন্মোচন করেছেন ...[২]

'শিখা'র প্রথম সংখ্যা (চৈত্র ১৩৩৩) প্রকাশকের নিবেদন-এ বলা হয় "শিখা'র প্রধান উদ্দেশ্য বর্তমান মুসলমান সমাজের জীবন ও চিন্তাধারার গতির পরিবর্তন সাধন। 'শিখা'র প্রথম সংখ্যায় আমরা যে প্রবন্ধগুলি সন্নিবেশ করেছি তার প্রত্যেকটি সমাজের দারুণ অভাবের এক একটি দিক লক্ষ্য করে লিখিত হয়েছে।"

এ সব বক্তব্য থেকে বোঝা যায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের লেখকদের জীবন দৃষ্টিতে ছিল যুক্তিবাদ এবং চিন্তাসংস্কার ও সমাজসংস্কারের দৃষ্টি। চিন্তার গতানুগতিকতা ও ঐতিহ্যের অন্ধ অনুবর্তিতা থেকে বাঙালি মুসলমান সমাজকে তারা মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এই লক্ষ্যে অতীতের ও বর্তমানের যা কিছু কল্যাণকর তা

".... আত্মসাৎ করে তাকে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন সঙ্কীর্ণতামুক্ত সুস্থ উদার বিশ্বমানবতার আকাশ তলে, সেখানে বাঙালি মুসলমান বিশ্বজনীন চিন্তার অংশীদার এবং আধুনিক জগতের প্রাগ্রসর সমাজ ও জাতিসমূহের সমপর্যায়ে সৃষ্টি চঞ্চল।"[৩] এ প্রসঙ্গে এস এম আলীর একটি মন্তব্যও উদ্ধৃতিযোগ্য :

> The main problem before the Muslim intellectuals was how to become a part of the modern world while remaining Muslims? They fully accepted the need of a change in the outlook of the Bengali Muslims.[8]

মুসলিম সাহিত্য সমাজের লেখকেরা ইতিহাসের তাৎপর্য বুঝতেন। তাই তারা জানতেন ইতিহাসের মুখ্য গতিধারা থেকে বিচ্ছিন্নতার অর্থ দুর্ভাগ্যকে বরণ করা। সেজন্য সমকালীন ইতিহাসের সঙ্গে মুসলিম সমাজকে সামিল করতে চেয়েছিলেন তারা। এ জন্য প্রয়োজন ছিল জ্ঞান ও বুদ্ধিচর্চার এবং তারই আলোকে সমাজ, ইতিহাস, ধর্ম, মূল্যবোধ ইত্যাদির বিচার-বিশ্লেষণ করা। এই রেনেসাঁসধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তারা ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান সমাজের যেসব বিধি-বিশ্বাস-প্রথা-সংস্কার তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের এবং একই সাথে সমাজ ও দেশের উন্নতি প্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দূর করতে চেয়েছিলেন। তারা বিশ্বাস করতেন এ না হলে মুসলমান সমাজের কোন উন্নতি তো হবেই না, উপরন্তু ইসলামের মতো একটি বিপ্লবমূলক ধর্ম নির্দিষ্ট ঘেরাটোপের মধ্যে গতিহীন হয়ে পড়ে থাকবে।

মুসলিম সাহিত্য সমাজের লেখকেরা ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ বিশ্বাসীদের সঙ্গে তাদের মৌল পার্থক্য ছিল এখানে যে, ধর্মকে তারা জ্ঞান ও বুদ্ধির সাহায্যে বুঝতে ও গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। বস্তুত জ্ঞান ও বুদ্ধিকে তারা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সাহিত্য সমাজের কর্মযোগী বলে অভিহিত আবুল হুসেনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় প্রকাশিত 'তরুণ পত্র' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, "মানুষের যথার্থ কল্যাণ হয় জ্ঞানে। কেহ কেহ বলিবেন ধর্মে। কিন্তু জ্ঞানহীন ধর্ম অর্থবিহীন। সুতরাং বলিব, মানুষের মুক্তি হয় জ্ঞানে।"[৫] এ উক্তি বস্তুত মুসলিম সাহিত্য সমাজেরই।

জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধির সাহায্যে এর আগে ইসলামকে দেখার চেষ্টা যে না হয়েছে তা নয়; মুসলিম বিশ্বের, এমনকি ভারতবর্ষেরও কেউ কেউ সে-চেষ্টা করেছেন। তারাও ইসলামের যুগানুগ রূপ দেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। তবে অন্তত দুটি ক্ষেত্রে ঢাকার চিন্তাবিদদের স্বতন্ত্র বিশেষত্ব ছিল। প্রথমত তারা কেবল শাস্ত্রকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা

করেন নি, বরং "......শাস্ত্রের কথা ও শাস্ত্রনিরপেক্ষ বাণী উভয়কেই তারা মর্যাদা দিয়েছিলেন মানববাদের মাপকাঠিতে বিচার করে।"[৬] দ্বিতীয় যে চিন্তা তারা করেছিলেন, তার দ্বারা সমাজ রূপান্তরের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে তারা সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার আত্যন্তিক প্রয়োজনবোধ করেছিলেন। সেজন্যই গঠিত হয়েছিল এই সংগঠন। বাংলার বাইরে আর কোথাও ইসলামের মূল ভিত্তি আল্লাহর একত্ব, রসুলের প্রেরিত ও কোরানের ঐশিতার উপর বিশ্বাস বজায় রেখে মুসলিম সমাজের যুগোপযোগী পরিবর্তন প্রচেষ্টার সংঘবদ্ধ আন্দোলন হয়নি।

তবে সাহিত্য সমাজের লেখকেরা ইসলামের মূল ভিত্তিসমূহের তাত্ত্বিক বা দার্শনিক আলোচনায় কেউ যাননি। সে উদ্দেশ্যও তাদের ছিল না। তারা কেউই ধর্মতাত্ত্বিক বা দার্শনিক ছিলেন না। তারা যা ছিলেন তা আবুল হুসেনের একটি উক্তিতে যথার্থরূপে চিহ্নিত হয়েছে। নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমার Position ঠিক দার্শনিকের নয়, আমার Position কতকটা কল্যাণ পিপাসু সামান্য কর্মীর। কর্মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার সর্বপ্রথম কর্তব্য। সে জন্যই আমার চিন্তাচর্চা করা।"[৭] তাই স্বাভাবিকভাবেই তারা ধর্মের তাত্ত্বিক দিক নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজনবোধ করেন নি, প্রয়োজনবোধ করেছেন তার মানবহিতের দিক নিয়ে ভাবতে। এ ব্যাপারে তাদের মতাদর্শ তারা স্পষ্ট করে ব্যক্তও করেছেন। মুসলিম সাহিত্য সমাজ, বিশেষত এর প্রধান ভাবুক ও লেখক কাজী আবদুল ওদুদ সম্পর্কে আহমদ শরীফের মতামত পর্যালোচনা প্রসঙ্গে প্রয়োজন অনুসারে সে-সব মতাদর্শের পরিচয় দেয়া যাবে।

দুই

মুসলিম সাহিত্য সমাজের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আহমদ শরীফের মতামত ব্যক্ত হয়েছে 'কাজী আবদুল ওদুদ' শীর্ষক দুটি ও 'ভিন্ন দৃষ্টিতে কাজী আবদুল ওদুদ' নামের আরেকটি রচনায়। প্রথম প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল সম্ভবত আবদুল ওদুদের মৃত্যুর (মে, ১৯৭১) অনতিকালের মধ্যে। ১৯৭৪ সালে এটি লেখকের 'যুগ যন্ত্রণা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। আরো পরে সংকলিত হয় সাঈদ-উর রহমান সম্পাদিত 'ওদুদ-চর্চা' গ্রন্থে। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি সংকলিত হয় ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত লেখকের 'সময় সমাজ মানুষ' নামক গ্রন্থে। আর তৃতীয় প্রবন্ধটি রচিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণাকেন্দ্র আয়োজিত কাজী আবদুল ওদুদ স্মরণে বিশেষ বক্তৃতামালায় (মে, ১৯৯৪) পাঠ করার উদ্দেশ্যে। এটিও একই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। পরে ১৯৯৬ সালে গবেষণাকেন্দ্রের 'নিবন্ধমালা' ৯ম খণ্ডেও এটি

সংকলিত হয়েছে। রচনা তিনটি আবদুল ওদুদ সম্পর্কে লিখিত হলেও প্রথম ও তৃতীয় প্রবন্ধ দুটি মূলত মুসলিম সাহিত্য সমাজের চিন্তা-দর্শনের স্বরূপ প্রকৃতির একটি মূল্যায়ন। সাহিত্য সমাজের বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অসাফল্যের কারণ নির্ণয়ে শেষের প্রবন্ধে ভিন্ন ধারণা ব্যক্ত করা ছাড়া এ দুটি রচনায় বক্তব্যগত তেমন কোন অমিল নেই। আমাদের এ আলোচনায় রচনা তিনটি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবন্ধ নামে উল্লেখিত হবে।

আহমদ শরীফ তার প্রথম প্রবন্ধ শুরুর অনতিপরে আপত্তি উত্থাপন করেছেন সাহিত্য সমাজের লেখকদের চিন্তার পদ্ধতি নিয়ে। তাঁর মতে তাঁদের অবলম্বিত পদ্ধতির গোড়াতেই রয়েছে গলদ। ধর্মের ও ধর্মবিশ্বাসের সংস্কার সাধনকে যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসে রয়েছে সেই গলদ। কেননা আবদুল ওদুদ তথা সাহিত্য সমাজ বিশ্বাসকে যুক্তিযোগে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, যুক্তি দিয়ে বিশ্বাসকে আবিষ্কার করতে চান নি। এর ফলে "এতে পুরোনো বিশ্বাস যুক্তি আশ্রয়ী হতে চেয়েছে মাত্র। ফলে বিশ্বাসও প্রাণ পায়নি, যুক্তিও পথ হারিয়েছে। কেননা, যেখানে জ্ঞান, বুদ্ধি ও যুক্তি অচল সেখানেই বিশ্বাসের জন্ম। এজন্যেই যুক্তির পথ বেয়ে বিশ্বাসের তোরণে কখনো উত্তরণ ঘটে না।"[৮]

বোধ করি না বললেও চলে যে বিশ্বাস বলতে আহমদ শরীফ এখানে ধর্ম তথা ঈশ্বর বিশ্বাসের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। ইসলামে বিশ্বাসের মূল ভিত্তি তিনটি— আল্লাহর একত্ব, রসুলের প্রেরিতত্ব ও কোরানের ঐশিত্ব। সাহিত্য সমাজের লেখকেরা এ তিনটিতে বিশ্বাস স্থাপন করেই তাদের উদ্দিষ্ট বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, যা আমরা আগেই বলেছি, ইসলামের এই মৌল ভিত্তি নিয়ে তারা কোন তাত্ত্বিক আলোচনা করতে যাননি অর্থাৎ ধর্মদর্শন তাদের আলোচ্য বিষয় ছিল না। আরো স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় ইসলামের মৌল ভিত্তিসমূহকে যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস তাদের লক্ষ্য ছিল না। বরং আবদুল ওদুদ সম্পর্কে আহমদ শরীফের এই ধারণাটি সত্য যে "... মহামানব মুহম্মদের সামাজিক ও আত্মিক জীবনের অখণ্ডতাবোধ অর্থাৎ বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের অভিন্ন সত্তার উপলব্ধি প্রসূত সমাজচিন্তা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত ও প্রলুব্ধ করেছিল।"[৯] আসলে সাহিত্য সমাজের লক্ষ্যই ছিল সামাজিক কল্যাণচিন্তা। এর সঙ্গে তারা সম্পৃক্ত করেছিলেন 'আত্মিক' বোধকে, বিশেষত আবদুল ওদুদ। সম্প্রতিকালে একজন মুসলিম চিন্তাশীল লেখক লিখেছেন, "সমাজ এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে কারোর সঠিক উপলব্ধি থাকলেই বরং ধর্মের সমাজ-সাংস্কৃতিক তাৎপর্যকে কেউ অস্বীকারের কথা না ভেবে কীভাবে সুস্থ সমাজ গঠন করা যায় সেটাই ভেবে দেখবেন।"[১০] আবদুল ওদুদ তথা সাহিত্য সমাজের লেখকদের জীবন দর্শন

প্রতিফলিত হয়েছে এই উক্তিতে। তারা ধর্মের সমাজ-সাংস্কৃতিক তাৎপর্যকেই উপলব্ধি ও সমাজ-মানসে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। আহমদ শরীফ যে-বিশ্বাসের কথা বলেছেন সেক্ষেত্রে ব্যাপক সংখ্যক মুসলমানের সঙ্গে আবদুল ওদুদের তফাত নির্দেশ করা প্রয়োজন । কাজী ওদুদের কাছে কোরানের বাণীর অর্থ জ্ঞান-নির্বিশেষ জ্ঞান। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীকে (১৮৯৬-১৯৫৪) একটি চিঠিতে তিনি লেখেন যে জ্ঞানের অর্থ "…. জ্ঞানের বিচিত্র ইঙ্গিত, কাজেই কোরআন থেকে, অথবা প্রয়োজন হলে কোরআন ত্যাগ করেও, সেই বিচিত্র জ্ঞানান্বেষণ মানুষের কাম্য– এটির উপকারিতা আর বিজ্ঞানবাদের উপকারিতা একই পর্যায়ভুক্ত।"[১১] বৃদ্ধ বয়সে তিনি যে কোরানের সরল বাংলা অনুবাদ করেছিলেন তার কারণ নিহিত রয়েছে ঐ একই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। তিনি চেয়েছিলেন সাধারণ মুসলমান কোরান থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করুক। মুহম্মদের জীবনী রচনার পেছনেও মূলত একই তাগিদ কাজ করেছিল। এই জীবনীতে তাই অনিবার্যত গুরুত্ব পড়েছে মুহম্মদের প্রেরিতত্বের উপর নয়, তার মানব মহিমার উপর। এ প্রসঙ্গে আরেকটি তথ্যের উল্লেখ বিশেষভাবে প্রয়োজন। সাহিত্য সমাজের পঞ্চম বর্ষের প্রথম সাধারণ অধিবেশনে কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১) ও মোক্তার আহমদ সিদ্দিকী মুহম্মদ সম্পর্কে দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সাহিত্য সমাজের অন্যতম লেখক মোতাহার হোসেনের 'মানুষ মোহাম্মদ' নামীয় প্রবন্ধে স্বভাবতই গুরুত্ব পড়ে মুহম্মদের মানবীয় গুণাবলীর প্রতি, অন্যদিকে মোক্তার আহমদ তাকে দেখেন অতি মানব হিসেবে। আলোচনা পর্বে কাজী আবদুল ওদুদ বলেন :

> হযরত মোহাম্মদ শেষ পয়গম্বর কি না, কোরান ফেরেস্তার মারফৎ অহিরূপে নাজেল হয়েছিল কি না, আজিকার দিনে এসব আমাদের বড় সমস্যা নয়— আমাদের সমস্যা হচ্ছে এই যুগে এই আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে দাঁড়িয়ে হজরত মোহাম্মদের জীবন ও কোরান থেকে আমরা আমাদের জীবনে কতখানি পাথেয় সংগ্রহ করতে পারি। হজরত মোহাম্মদের বিরাট ব্যক্তিত্ব যেন আমাদের চোখ ঝলসে না দেয়। হজরত মোহাম্মদের জীবনের কোন সাধনা যদি আমরা আমাদের জীবনে না নিতে পারি— তাহা পরিহার করতে যেন আমাদের এতটুকু দ্বিধা না হয়।

এই আলোচনায় আবুল হুসেনও অংশ নেন। তার আলোচনাটিও বর্তমান প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বলে উদ্ধৃত করা জরুরি বিবেচনা করি। তিনি বলেন :

> হজরতের জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারকে Justify করে মুসলমানদের আর কোন লাভ নেই, তাঁকে বিচার করতে হবে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবে—

ইতিহাসে এক অতীত যুগে ভিন্ন আবেষ্টনে তিনি জন্মেছিলেন, সেখানে বসে তিনি যে জীবন যাপন করেছেন, যে শিক্ষা দিয়েছেন, তার থেকে এই যুগে এই দেশে বসে আমরা কতটুকু আলো পাই আমাদের জীবন চলার পথে আমরা শুধু তাই নেব। তা না করে যদি আমরা পদে পদে তাঁকে Justify করতে যাই তাহলে তাঁকেও বুঝা হবে না, আমরা নিজেরাও শুধু বিড়ম্বিত হব।[১২]

কাজেই আহমদ শরীফ যখন বলেন সাহিত্য সমাজের লেখকেরা প্রাচীনের প্রতি আন্তরিক অনুগত ছিলেন ও তারা শৈশবে লব্ধ ঘরোয়া বিশ্বাস-সংস্কার ছাড়তে চান নি[১৩] কিংবা "... মূলত আবাল্য শোনা, দেখা, জানা, বোঝা বিশ্বাসের, সংস্কারের, ধারণার পরিসরেই ছিল তাঁর (কাজী ওদুদের) চেতনা-চিন্তার পরিক্রমা সীমিত।"[১৪] – তখন তা সম্পূর্ণ সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না। সাহিত্য সমাজের লেখকদের, বিশেষত সমাজের দুই প্রধান ভাবুক আবদুল ওদুদ ও আবুল হুসেনের ধর্মপালন সংক্রান্ত মতামতে দেখা যায় তারা ধর্মের বাহ্যিক আচরণের চাইতে তার অন্তর্নিহিত লক্ষ্যের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। আবদুল ওদুদ ধর্ম বলতে মুখ্যত বোঝাতে চেয়েছেন জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব সাধনাকে; আচার-অনুষ্ঠানকে দেখেছেন সে-তুলনায় গৌণ দিক হিসেবে। আর আবুল হুসেন তার বিতর্কিত 'নিষেধের বিড়ম্বনা' প্রবন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে ইসলামে যেসব ধর্মীয় আচার রয়েছে তা পালন করে মুসলমানরা যদি সৎ, সুন্দর, নীতিবান ও মহৎ হতে না পারে তবে ঐ সব আচার পালনের প্রয়োজন ও সার্থকতা কোথায়? এসব তথ্য ও উক্তি থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ইসলাম ধর্মকে তারা আত্মিক ও জাগতিক উন্নতির সহায়রূপে দেখেছিলেন, যেখানে তা সে-উন্নতির প্রতিবন্ধক অথবা ইসলাম সম্পর্কে মুসলমানের যে যে ধারণা প্রগতিবিরুদ্ধ সেগুলিকে তারা মানতে চান নি এবং তা পরিহার করতে বলেছেন।

সাহিত্য সমাজের লেখকেরা জীবনের গতিশীলতায় বিশ্বাসী ছিলেন। আর সেজন্য তারা প্রয়োজবোধ করেছিলেন জ্ঞান ও চিন্তাচর্চার। লক্ষ্য করবার বিষয় যে রস-সাহিত্য চর্চার উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংগঠনের জন্ম হয় নি, যদিও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেউ কেউ সে-সাহিত্যের চর্চা করেছিলেন, কিন্তু এর জন্মের পেছনে মূল তাগিদ ছিল স্বাধীনভাবে জ্ঞান ও চিন্তাচর্চা করা। ইসলাম ধর্মেও জ্ঞান ও চিন্তাচর্চার কথা বহুবার বলা হয়েছে। জীবনকে কালানুগ করে গড়ে তোলার অবকাশও ইসলামে রয়েছে। ধর্মীয় পরিভাষায় যাকে 'ইজতেহাদ' বলা হয় তার মধ্যেই রয়েছে সেই অবকাশ। কিন্তু দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে ইজতেহাদের অধিকার কালে কালে উলেমাদের হাতে গণ্ডিবদ্ধ হয়ে পড়ে। সামন্ততন্ত্রেরই এ অন্য এক রূপ। সাহিত্য

সমাজের লেখকদের চিন্তাধারায় ঐ গণ্ডি ভাঙ্গার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা ছিল। মূলত একারণেই আকরাম খাঁ, ঢাকার সমাজপতি প্রমুখেরা তাদের প্রতি খড়গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

ঈশ্বরের অস্তিত্বে তথা ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করলেই যে মানব-প্রগতি নিরুদ্ধ হয়ে যাবে একথা সম্পূর্ণরূপে মান্য নয়। ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেও অনেকখানি স্বাধীন চিন্তার অধিকারী হওয়া যায়। মানুষের চিন্তার ইতিহাসে তার নজির আছে। আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেনরাও তা-ই ছিলেন। তাদের কথা লোকে মেনেছে কি না কিংবা অনুসরণ করেছে কি না সে-প্রশ্ন আলাদা। কিন্তু ধর্ম বিশ্বাসে বা ধ্যান-ধারণায় আঘাত তার একমাত্র কারণ নয়, অন্য কারণগুলি নিহিত রয়েছে রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি ব্যবস্থার মধ্যে।

আহমদ শরীফ ধারণা ব্যক্ত করেছেন যে কাজী ওদুদেরা হয়তো ভেবেছিলেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছে শাস্ত্রে আস্থার ও আনুগত্যের অঙ্গীকারের কথা না বললে তাদের বক্তব্যের কোন আবেদন থাকবে না এবং কোন সাড়াও মিলবে না। এই মনোভাব বা কৌশলকেই হয়তো তিনি বলেছেন 'রামমোহনী কায়দা।'[১৫] এই ধারণায় কিছু সত্য আছে বলে মনে হয়।

যাই হোক, আহমদ শরীফ মনে করেন সাহিত্য সমাজের লেখকেরা যে কথা বলতে চেয়েছিলেন তাতে ধর্মের 'জারক রস' মেশানো উচিত হয়নি। "কেননা তাঁদের আবেদন ছিল বাস্তব সমস্যার ভিত্তিতে মানুষের বুদ্ধি, শ্রেয়ঃচেতনা, বিচার শক্তি তথা যুক্তিবোধের কাছে। এরূপ ক্ষেত্রে ধর্মীয় মোড়কে পরিবেশিত তত্ত্ব প্রায়ই লক্ষ্যভ্রষ্ট করে এবং কেবল নতুন গোঁড়ামীর জন্ম দেয়, যা আরো ক্ষতিকর হয়, অগ্রাহ্যও হয়।"[১৬] এ বক্তব্যের প্রথমাংশের সঙ্গে দ্বিমত পোষণের অবকাশ নেই, কিন্তু শেষাংশে তা আছে বলে আমাদের মনে হয়। আবদুল ওদুদ বা আবুল হুসেনের এতদসংক্রান্ত লেখা পড়লে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ধার্মিকতা বলতে তারা বুঝেছেন নীতিবান, বিবেকবান, হৃদয়বান, চরিত্রবান, বিচারপ্রবণ প্রভৃতি গুণান্বিত হওয়া। আল্লাহর গুণে বিভূষিত হও— এই হাদিসটিকে তারা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখেছিলেন এবং মুসলমান সমাজকে আহ্বান জানিয়েছিলেন সে-সব গুণ অর্জন করার জন্য। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তা করতে পারলে মুসলমানরা খাঁটি মানুষে পরিণত হতে পারবে। তারা চেয়েছিলেন আদর্শবান মানুষ, যেমন তারা নিজেরা ছিলেন। তাদের বক্তব্য অগ্রাহ্য হতে পারে, কিন্তু তা নতুন গোঁড়ামির জন্ম দেবে কেন, আর তা ক্ষতিকরই-বা হবে কেন?

এসব কথা তারা যাদেরকে বোঝাতে চেয়েছিলেন সেই বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায় ছিল বিশেষভাবে ধর্মকাতর কিন্তু প্রকৃত ধর্মবোধশূন্য অথবা সেই বোধের কম-বেশি অভাব তাদের মধ্যে ছিল। ফলে তাদের কল্যাণ চাইতে গিয়ে সাহিত্য সমাজের লেখকদের ধর্ম নামক ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণ অন্তরালে রেখে কিছু বলা বা করা সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। সাহিত্য সমাজ-বহির্ভূত প্রগতিকামী অন্য মুসলিম লেখকদের রচনাবলীর দিকে তাকালেও এই সত্যই চোখে পড়ে। এ প্রসঙ্গে রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-৯১) ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। সতীদাহ প্রথা নিবারণ ও বিধবা বিবাহ প্রচলনেরও আবেদন ছিল মূলত মানুষের মানবিকতা, শ্রেয়ঃচেতনা ও বিচারবোধের কাছে। কিন্তু তারা উপলব্ধি করেছিলেন ধর্মার্ত হিন্দু সমাজমনের কাছে— যা ছিল মানবিকবোধশূন্য— শুধু আবেদন জানালে কাজ হবে না। তাই শাস্ত্র ঘেটে তাদের আহরণ করতে হয়েছিল যুক্তির আয়ুধ। কেননা এসব সমস্যা একান্তভাবে মানবীয় হলেও তার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিল ধর্মবিশ্বাস। মুসলমান সমাজেরও অনেকগুলি সমস্যা ছিল ধর্ম ও ধর্মকেন্দ্রিক বিশ্বাস সম্পৃক্ত। তাই কেবল শ্রেয়ঃচেতনা আর যুক্তিবোধের কাছে আবেদন পেশ করলেই তাদের উদ্দেশ্য সফল হতো এমন কথা নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয়। কেননা মুসলিম-মানস তার উপযোগী ছিল না। সাহিত্য সমাজ বস্তুত সে কাজটিই করতে চেয়েছিলেন।

আহমদ শরীফ লিখেছেন বাস্তব-বৈষয়িক জীবনে বিশ্বাসকে আক্ষরিক অর্থে প্রয়োগ করার পথে বিস্তর বাধা। বিশ্বাসের প্রিয় অনুভূতিকে ভিন্ন মনের মানুষের সঙ্গে জাগতিক কারবারের লেন-দেনে প্রয়োগ করতে চাইলে বিড়ম্বিত হতে হয়। তাই "*ঠেকে ঠেকে* এ উপলব্ধি হয়েছে যাদের, তারাই বলছে যে, ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণ একান্তই ব্যক্তিগত জীবনে সীমিত রাখা বাঞ্ছনীয়। কারণ তার সমাজানুগত্য প্রাপ্তির দিন ফুরিয়ে গেছে। বিভিন্ন ধর্ম ও মতাবলম্বী অধ্যুষিত রাষ্ট্রে ও বিশ্বে ধর্মকে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণে সীমিত রাখলে ধর্মবিশ্বাস সঞ্জাত অনেক দ্বন্দ্বের কারণ লুপ্ত হয়, পরিচ্ছন্ন নাগরিক বোধ জন্মে এবং সর্বজনীন কল্যাণ সাধনে চিন্তা ও কর্ম নিয়োজিত করা সহজ হয়।"[১৭] যারা '*ঠেকে ঠেকে*' শিখেছে এ উপলব্ধি কেবল তাদের নয়, বোধকরি আহমদ শরীফের নিজেরও এবং অন্তত এই ক্ষেত্রটিতে সাহিত্য সমাজের লেখকদের মতাদর্শের সঙ্গে তার উপলব্ধির তফাত নেই। কারণ তারাও ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণকে ব্যক্তিজীবনে সীমিত রাখার কথাই প্রকারান্তরে বলেছেন, তাকে সমাজ বা রাষ্ট্রান্তর্গত করার কথা বলেন নি।

এ ক্ষেত্রে সম্রাট আওরঙ্গজীব, শাহওয়ালীউল্লাহ, তীতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ, দুদু মিয়া, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী প্রমুখের প্রচেষ্টার সঙ্গে সাহিত্য সমাজের লেখকদের উদ্দেশ্যের পার্থক্যও স্পষ্ট হয়। আমরা এদের প্রসঙ্গ তুলছি এ কারণে যে আহমদ শরীফ তার লেখায় এদের কথা উল্লেখ করেছেন। তৃতীয় প্রবন্ধটিতে তিনি ওহাবি-ফরাজিদের ভাবাদর্শ ও কর্মপ্রয়াসের সঙ্গে সাহিত্য সমাজের আন্দোলনকে খানিকটা এক করে দেখতে চেয়েছেন বলে মনে হয়।[১৮] কিন্তু সে অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। কেননা আবদুল ওহাব, আওরঙ্গজীব প্রমুখেরা চেয়েছিলেন ইসলামের আদি বিশুদ্ধতায় ফিরে যেতে এবং ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করতে। অন্যদিকে কাজী ওদুদেরা চেয়েছিলেন ব্যক্তিজীবনে সৎ, সুন্দর, হৃদয়বান হওয়া অর্থে ধার্মিক হতে। তারা কখনোই ওহাবীদের মতো ইসলামের আদি বিশুদ্ধতায় ফিরে যাওয়ার কথা ভাবেন নি, জামাল উদ্দীন আফগানির (১৮৩৯-৯৭) মতো বিশ্বমুসলিমবাদ (Pan-Islamism) প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন নি, এমনকি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথাও কোথাও বলেন নি। আধুনিক বিশ্বে এসব যে সম্ভব নয়, এ যে কেবলই স্বপ্ন সে-বিষয়ে তারা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাদের ইতিহাসচেতনা নিয়ে প্রশ্ন তোলার তেমন অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

অথচ আহমদ শরীফ সেই প্রশ্ন তুলেছেন। সাহিত্য সমাজ যাদের কাছে বুদ্ধির মুক্তির আবেদন জানিয়েছিল তারা ছিল মূঢ়, তাদের চেতনায় সংস্কারের কু বা সু বলে কোন কিছু ছিল না, সবটাই ছিল তাদের ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ, সুতরাং আবশ্যিক। তাই সাহিত্য সমাজ যা-কিছুকে কুসংস্কার বলে আবর্জনারূপে দেখেছে ওরা সেসবকে বিশ্বাসের আবরণ বলে জানত। তাই স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্য সমাজের আবেদন ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু পরে, "... সমাজে প্রতীচ্য বিদ্যা বিস্তারের ফলে তা বিনা প্রচারণায় ও প্ররোচনায় স্বাভাবিকভাবেই হতে দেখেছেন তাঁদের বার্ধক্যে। তাঁদের অভিপ্রেত মানুষে তখন সমাজ ভরে উঠেছে। রামমোহনও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তাই দেখেছিলেন, আরো দীর্ঘজীবী হলে তিনিও দেখতেন ও বুঝতেন যে বীজ অঙ্কুরিত ও বৃক্ষ ফলপ্রসূ হবার একটা মৌসুম আছে। সেজন্য অপেক্ষা করতে হয়। কলা-কাঁঠালের মতো সব ফল অকালে পাকানো যায় না। কৃত্রিম উপায়ে সর্বক্ষেত্রে সাফল্য সম্ভব নয়। বিধবা বিবাহ প্রচলনে ব্যর্থতা তার প্রমাণ।"[১৯]

এই উদ্ধৃতিতে ইতিহাস তথা বাস্তবচেতনার অভিযোগ কেবল কাজী ওদুদ বা সাহিত্য সমাজের বিরুদ্ধেই নয়, রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধেও তোলা হয়েছে। এরা যা করার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তা না করে যদি অপেক্ষা করতেন তাহলেও একদিন দেখতেন তাদের অভিপ্রেত আকাঙ্ক্ষা 'বিনা প্রচারণায় ও

প্ররোচনায়' বাস্তবায়িত হয়েছে এমন একটি বক্তব্য কি উদ্ধৃতিটি থেকে প্রতীয়মান হয় না? তাহলে ঐ বক্তব্যের পরপরই আবার একথা বলার সার্থকতা থাকে কোথায় যে, "তবু অবশ্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। মানুষ ভাগ্যের উপর ভরসা করে বসে থাকতে পারে না?"

তাছাড়া আরো প্রশ্ন জাগে কাজী ওদুদের বার্ধক্যে অর্থাৎ বিশ শতকের ষাটের দশকে তার অভিপ্রেত মানুষে সত্যিই কি সমাজ ভরে উঠেছিল? এ প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ আরো লিখেছেন আজকের বাংলায় অর্থাৎ ঐ ষাটের দশকে পুরনো জীবন দৃষ্টির আশু অবসানের আভাস মিলছে, তরুণ মনে নানা কারণে আধুনিকতার বীজ দ্রুত উপ্ত হচ্ছে। বাঙালি মুসলিম মানসের কোন কোন লক্ষণে আবদুল ওদুদের অভিপ্রেত মানুষে সমাজ ভরে উঠতে তিনি দেখেছিলেন কিংবা দেখেছিলেন তরুণ মনে আধুনিকতার বীজ দ্রুত উপ্ত হতে তা যদি স্পষ্ট করে বলতেন তাহলে পাঠকের পক্ষে বুঝতে সুবিধা হতো। বলা দরকার যে ১৯৯৪ সালে পঠিত প্রবন্ধে এদের সম্পর্কে একটি কথাও তিনি উচ্চারণ করেননি। শিক্ষিত বাঙালি সমাজে প্রগতিশীলতার যেটুকু পরিচয় লভ্য তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সে কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল, রামমোহন-বিদ্যাসাগর ওদুদ প্রমুখের কোন প্রভাব তাতে নেই। অথচ দেশে তো আজো পাশ্চাত্য শিক্ষাধারা প্রচলিত। তাহলে তামস মনোবৃত্তিসমূহ-অনৈতিকতা, চরিত্রহীনতা, লোভ, রিরংসা, মিথ্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, এককথায় মনুষ্যত্বহীনতা রাষ্ট্রযন্ত্রের তাবৎ অঙ্গকে গ্রাস করে ফেলবে কেন? কেনইবা বৃদ্ধি পাবে ধর্মীয় আবেগ, অসহিষ্ণুতা, অতীতমুখিতা, ভাগ্যনির্ভরতা আর সেই সাথে শক্তি সঞ্চয় করবে ধর্মীয় মৌলবাদ? আবদুল ওদুদের সময়ের তুলনায় আজকের সময় কতটুকু এগিয়েছে বা পিছিয়েছে তা যদি বলতেন সমাজ-বীক্ষণে তীক্ষ্ণদৃষ্টি আহমদ শরীফ, তাহলে মুসলিম সাহিত্য সমাজ সম্পর্কে তাকে হয়তো নতুন করে ভাবতে হতো। তার এই শেষ রচনাটি যে আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করে না সেকথা বলাই বাহুল্য।

'শিখা'র মুখবাণী তথা সাহিত্য সমাজের চিন্তা-দর্শনের সারাৎসার জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট মুক্তি সেখানে অসম্ভব— এর জ্ঞান ও বুদ্ধিচর্চা 'নিতান্ত সীমিত তাৎপর্যে ব্যবহৃত বলে আহমদ শরীফ মনে করেন। কেননা "... অধ্যাত্ম ও অলৌকিক অদৃশ্য আসমানী বিশ্বাসকে বিশুদ্ধ ও অবিকৃত রাখাই এঁদের লক্ষ্য। কাজেই ... মুক্ত বুদ্ধি এ নয়, ডিগদড়ি দেয়ার বিশ্বাসের পরিসর স্বচ্ছ ও কল্যাণকর করাই এ জ্ঞান-বুদ্ধি অর্জনের ও প্রয়োগের লক্ষ্য।"[২০] প্রমাণ বহির্ভূত অলৌকিক শক্তিতে ও অপৌরুষের বাণীতে বিশ্বাস যুক্তি-বুদ্ধিকে সীমিত করে সত্য, কিন্তু অপৌরুষেয় বাণীর অমোঘতা ও চিরন্তনতা সম্পর্কে সাহিত্য সমাজের, বিশেষত

আবদুল ওদুদ ও আবুল হুসেনের মতামত বিচার করলে একথা জোর দিয়ে বলা যাবে না যে তাদের 'বিশ্বাস' 'বিশুদ্ধ ও অবিকৃত' থেকেছে। সুতরাং তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিচর্চার বিষয়টি নিতান্ত সীমিত তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়েছে এ মত স্বীকার করা যায় না, তবে তা কিছুটা যে সীমিত হয়ে পড়েছে সেকথা অবশ্য সত্য। এর ফলে তাদের বিশ্বাস ও বক্তব্যে যে বৈপরীত্য ঘটেছে তাও সত্য। এর একটি বড় দৃষ্টান্ত আবদুল ওদুদের লেখা থেকে আহমদ শরীফ তার দ্বিতীয় প্রবন্ধে দিয়েছেন, যেখানে তিনি লিখেছেন, "যুক্তিবিচারের অনুবর্তিতা ও কুরআনের অনুবর্তিতা এ দুটি পৃথক করে দেখা অসঙ্গত।" এ উক্তিটিকে আহমদ শরীফ যে মুমিনের প্রত্যয়জাত কিন্তু যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক অনুশীলনজাত মনে করেন নি তাতে দ্বিমত প্রকাশের কারণ নেই।

আহমদ শরীফ আবদুল ওদুদকে সাহিত্য সমাজের প্রধান লেখক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে রাজি নন, সে মূল্য তিনি দিতে চেয়েছেন আবুল হুসেনকে। তা তিনি দিতেই পারেন, কিন্তু যখন তিনি বলেন যে আবদুল ওদুদকে সাহিত্য সমাজের প্রভাবিত বা আদর্শে অনুপ্রাণিত লেখক বলা যায় না তখন বলতেই হয় এ উক্তি বিচারসম্মত নয়। যে যুক্তিতে এ উক্তি তিনি করেছেন তা নিতান্তই দুর্বল। তিনি লিখেছেন 'সাহিত্য সমস্যা', 'বাঙলার জাগরণ', 'বাঙলা সাহিত্যের চর্চা', 'গ্যয়টে' মাত্র এই কটি রচনা কাজী ওদুদ 'শিখা'তে লিখেছিলেন। তার বিখ্যাত ও বিতর্কিত 'সম্মোহিত মুসলমান' সাহিত্য সমাজের অধিবেশনে পঠিত হলেও প্রকাশিত হয়েছিল অন্যত্র।[২১] কেবল এই যুক্তিতে কি উক্ত মূল্যায়ন করা যায়? হয়তো আহমদ শরীফ অবহিত ছিলেন না যে ১৯৩২ সালে আবুল হুসেনের ঢাকা ত্যাগের পর ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত দশম বার্ষিক অধিবেশন পর্যন্ত সাহিত্য সমাজের কাণ্ডারী ছিলেন আবদুল ওদুদ এবং এ প্রসঙ্গে এ তথ্যও উল্লেখ্য যে তিনি সাহিত্য সমাজের যতগুলি অধিবেশনে উপস্থিত থেকেছেন তত আর কেউ থাকেননি। সাহিত্য সমাজের ভাবাদর্শ তার মধ্যে ছিল কি না তা তার রচিত শেষ গ্রন্থ 'হযরত মোহাম্মদ ও ইসলাম' (১৩৭৩)-এও পাঠক পাবেন।

একথা সত্য যে আবদুল ওদুদ তথা সাহিত্য সমাজের চিন্তা ও কর্মকাণ্ডকে দ্রোহ বলা যাবে না, তা হয়তো এক ধরনের আপোষই। এ-ও মিথ্যা নয় যে রামমোহনের মতো তারা 'বেপরোয়া' হয়ে উঠতে পারেননি, কিন্তু তাদের চিন্তায় ও কর্মকাণ্ডে দ্রোহের লক্ষণ একেবারেই ছিল না তা নয়, আর ছিল সাহসিকতা। যেসব কথা তারা বলেছিলেন তার জন্য যথেষ্ট সাহসিকতার দরকার ছিল। কেন তারা বেপরোয়া হননি বা হতে পারেন নি তার সঠিক কারণ ধরা পড়েছে, আমাদের মনে হয়, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর বিশ্লেষণে। কাজী ওদুদ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> তিনি যে উগ্র হন নি তার কারণ এই যে, উগ্রতার পথে অগ্রসর হলে তাঁর সংগ্রাম আত্মধ্বংসী হয়ে পড়ত, সে সংগ্রামের চরিত্র সম্পূর্ণ বদলে যেত; কেননা তাঁর কাজ ছিল না আগুন জ্বালানো, কাজ ছিল আলো জ্বালানো। আগুন অত্যাবশ্যক সামগ্রী, কিন্তু অগ্নিকাণ্ডকে যিনি ভয় পান, যাঁর লক্ষ্য মানুষের মনে মনে আলোর শিখাকে প্রজ্বলিত প্রদীপ্ত করা, তাঁকে উত্তেজনা পরিহার করতে হয়, তাঁকে অগ্রসর হতে হয় অতি সতর্ক পদক্ষেপে। লক্ষ্য রাখতে হয় যেন হাত কেঁপে না ওঠে অতি উৎসাহে, আলো যেন আগুন না হয়ে পড়ে, যাতে ভাবালুতার বাষ্প কি উন্মাদনার ঝাপটা এসে শিখাটিকে একেবারে নিবিয়ে না দেয়। এই কঠিন পরিশ্রম সাপেক্ষ, দীর্ঘসূত্র ও দায়িত্বশীল কর্তব্যের পথে কাজী আবদুল ওদুদ অগ্রসর হয়েছিলেন।[২২]

আহমদ শরীফ নিজেও লিখেছেন সাহিত্য সমাজের লেখক-কর্মীরা মুসলমান সমাজকে গোঁড়ামিমুক্ত গ্রহণশীল ও গতিশীল করতে চেয়েছিলেন। প্রাচীনের প্রতি তাদের কিছুটা আকর্ষণ ছিল বটে কিন্তু প্রতীচ্য প্রভাবজাত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিও তাদের ছিল। এ যদি সত্য হয় তাহলে তাদের রিভাইভালিস্ট বা পুনর্জাগরণবাদী বলা যায় কি? অথচ আহমদ শরীফ তাই বলেছেন। পুনর্জাগরণবাদীদের মধ্যে গ্রহণশীলতা, গতিশীলতা, আধুনিকতা এসব লক্ষণ থাকে কি? এদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি নিজেই তো লিখেছেন, "Revivalist রা আসলে রক্ষণশীল, পুরোনো প্রীতি তাদের পিছু টানে, সমুখে এগিয়ে দেয় না— মেরামতে স্বকালোপযোগী হতে অনুপ্রাণিত করে মাত্র।"[২৩] জীবনের গ্রহিষ্ণুতা ও চলিষ্ণুতা সম্পর্কে সাহিত্য সমাজের লেখকদের বহু উক্তির মধ্যে একটি মাত্র উক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি :

> আমাদের দেহকোষাণুসমূহ অক্সিজেন-সংস্পর্শে প্রতি মুহূর্তে দগ্ধ ও পুনর্গঠিত হয়, এমনি করেই দেহ সবল ও কার্যক্ষম থাকে, আমাদের চিত্তকেও তেমনিভাবে নব নব জ্ঞান ও প্রেরণার দহনে নিরন্তর দগ্ধ ও সঞ্জীবিত করতে হয়, নইলে জড়তার আক্রমণ প্রতিরোধে অসমর্থ হয়ে তা সম্পূর্ণ অকর্মণ্য ও জীবনের পক্ষে অভিশাপের মতো হয়ে দাঁড়ায়, নূতন করে এ জ্ঞানের দহনে আমাদের সমস্ত জড়তা ভস্মীভূত হয়ে যাক; আর আমাদের চিত্তে বল সঞ্চার করুক এই নব বিশ্বাস যে, মানুষের চলার জন্য বাস্তবিকই কোন বাঁধানো রাজপথ নেই, জগৎ যেমন একস্থানে বসে নেই মানুষও তেমনি তার পরিবর্তনশীল পরিবেষ্টনকে নিয়ে একস্থানে স্থির হয়ে নেই আর এই পরিবর্তনশীল পরিবেষ্টনের ভিতর দিয়ে পথ করে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন অন্ধ অনুবর্তিতার নয়, সদাজাগ্রতচিত্ততার। [২৪]

এ উক্তিতে রক্ষণশীলতার ও পিছুটানের কোন পরিচয় আছে কি? অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে রক্ষণশীল ও পিছুটানের লোকেরাই তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। তাদের সম্পর্কে আজকের দিনেও তারা আলাদা কোন অবস্থানে নেই। তার কারণ কি এই নয় যে তারা প্রথানুগত ছিলেন না? তারা পুরনোকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেননি বটে কিন্তু পুরনোর কেবল সেইটুকুই তারা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন যা আজকের জীবনের জন্যও কল্যাণদায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। রেনেসাঁস তো পুরনোকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ও অবজ্ঞা করে না, তাকে নতুন করে আবিষ্কার ও মূল্যায়ন করে।

বাংলার উনিশ শতকী রেনেসাঁস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আহমদ শরীফ মধ্যযুগের পাল আমলের বিদ্যাচর্চা, সেন যুগের শাস্ত্র ও সাহিত্যানুরাগ, দক্ষিণ ভারতের রামানুজ-ভাস্কর-মাধব-নিম্বতার্ক-বল্লভের ভক্তিবাদ, উত্তর ভারতের নানক-কবির দাদু-রামানন্দ-একলব্য-রামদাস প্রমুখের সন্তধর্ম, বাংলার চৈতন্যদেবের প্রেমবাদ প্রভৃতি ঘটনাবলিকে 'ছোটো খাটো' রেনেসাঁস বলেছেন। এরপর এমন কথাও বলেছেন যে "এ তাৎপর্যে এ মুহূর্তের ঢাকায়ও রেনেসাঁস ঘটছে।" ১৯৮৫ সালে মুক্তধারা প্রকাশিত 'কালের দর্পণে স্বদেশ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণের স্বরূপ' শীর্ষক প্রবন্ধে একথা লিখেছেন তিনি (পৃ. ৩৬)। বিদ্রূপাত্মক কোনো ভঙ্গি থেকে তিনি এসব কথা লিখেছেন বলে মনে হয় না। তাহলে ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনকে রেনেসাঁস হিসেবে গণ্য করতে আপত্তি কোথায়?

আহমদ শরীফের দৃষ্টিতে মুসলিম সাহিত্য সমাজ ইয়ং বেঙ্গলের নকল মূর্তি বলে বিবেচিত হয়েছে।[২৫] এ বিবেচনাও বিচারসহ নয়। ইয়ং বেঙ্গলের সাথে আরো কেউ কেউ সাহিত্য সমাজের তুলনা করেছেন। সে তুলনা করা হয়েছে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তার পরও অন্তত দুটি দিক থেকে সাহিত্য সমাজ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ছিল– প্রথমত সাহিত্য সমাজের আন্দোলনে আবেগবাহুল্য ছিল না, দ্বিতীয়ত তাদের চিন্তা ও কর্মকাণ্ড বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ ছিল না। এজন্য দেখতে পাই বহু শিক্ষিত হিন্দু এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। সাহিত্য সমাজের লেখকেরা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন, তারা বিশেষভাবে মুসলমানের কল্যাণ চেয়েছেন কিন্তু সামগ্রিকভাবে তারা মানুষের কল্যাণচিন্তাও করেছেন। হিন্দু-মুসলিম মিলন-কামনা তারা আন্তরিকভাবে করতেন। স্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তা-চেতনা থেকে তারা ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। আসলে আন্তরধর্মে তারা ছিলেন সেক্যুলার মানুষ।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ সম্পর্কে আলোচনায় তার সাফল্য-অসাফল্যের প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই ওঠে। আহমদ শরীফের আলোচনায়ও তা উঠেছে। কিন্তু তার মতামত সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয় এবং কোথাও কোথাও তা স্ববিরোধী। প্রথম

প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে প্রাচীনের প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মধ্যে সাহিত্য সমাজের আবেদনের ব্যর্থতার বীজ নিহিত ছিল।[২৬] আবার বলেছেন সেকালে বিশ্বাসী মানুষ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মূঢ়তা বশে যুক্তি সহ্য করত না বলে তাদের আবেদন সফল হয়নি।[২৭] অন্য দুটি প্রবন্ধে অসাফল্যের ভিন্ন কারণ দেখানো হয়েছে। যেখানে তিনি বলেছেন সাহিত্য সমাজের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলদের শক্তিশালী ভূমিকা তো ছিলই, তদুপরি নানা কারণে মুসলিম-মানসে হিন্দুবিদ্বেষ ও প্রখর স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনা বৃদ্ধি, পরিণামে পাকিস্তান প্রস্তাব মুসলমান সমাজের চিন্তা-চেতনা লক্ষ্যকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে। কাজেই শিখা গোষ্ঠী কলাগত কারণে মুসলিম মানসে কোনই 'প্রত্যক্ষ প্রভাব' ফেলতে পারে নি এবং সম্ভবত 'ক্ষণপ্রভাও' সৃষ্টি করেনি।[২৮] মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে আবদুল হক (১৮১৮-৯৭) সম্পর্কে লেখা একটি প্রবন্ধে অসাফল্যের একই কারণ নির্দেশ করে তিনি এই মন্তব্য করেন যে, "তাই মুসলিম সাহিত্য সমাজের চিন্তা-চেতনায় মুসলিম সমাজ মোটেও উপকৃত হয়নি। এ তথ্য তত্ত্ব ও সত্য স্বীকার করাই ভাল।"[২৯]

অথচ একই প্রবন্ধে আবদুল হকের চিন্তা-চেতনায় আবদুল ওদুদের প্রভাব সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন, "সম্ভবত উদ্ভিন্ন যৌবনকালে এ তরুণের মনে-মেজাজে কাজী আবদুল ওদুদের যৌক্তিক-বৌদ্ধিক চিন্তা-চেতনার ও উদার মন-মননের স্থায়ী প্রভাব পড়েছিল।"[৩০] আর প্রথম প্রবন্ধটি যে বক্তব্য দিয়ে শেষ করা হয়েছে তাতেও রয়েছে প্রভাবের স্পষ্ট স্বীকৃতি :

> কাজী আবদুল ওদুদের সেদিনকার যুক্তিবাদ, সংস্কার মুক্তি, সোচ্চার হবার দুঃসাহস, নতুন চিন্তা, দীপ্ত মনীষা সেদিনের চেতনা চঞ্চল মুসলিম তরুণ বুকের ভয় তাড়িয়েছিল। রাত্রির সমুদ্রে দিগভ্রান্ত পথ সন্ধানী নাবিকের মতো স্বসমাজের হিত সাধনের পন্থা সন্ধানে ব্রতী তরুণকে আলোর ইশারা দান করেছে তাঁদের রচনা, প্রতিবাদে সরব হবার সাহস যুগিয়েছে। সমাজের সামগ্রিক সত্তায় চেতনা সঞ্চার সম্ভব হয়নি বটে, কিন্তু সমভাবাপন্ন ব্যক্তি চিত্তের বিকাশ সাধনের সহায়ক হয়েছে। এই প্রভাব দৃশ্য নয় সত্য, কিন্তু ফলপ্রসূ। সমাজধর্ম-আচার রীতি রেওয়াজ রাষ্ট্র ক্ষেত্রে পরবর্তীকালের বহু বিদ্রোহী বিপ্লবীর অস্বীকৃত ও পরোক্ষ লালনকর্তা এঁরাই। কাজী ওদুদের যুক্তিবাদিতা, মনীষা, শ্রেয় চেতনা, সত্যানুরাগ ও উদার নিরপেক্ষ দৃষ্টি প্রগতিবাদী বহু তরুণকে ঋণী করেছে, সন্দেহ নেই। কত হৃদয়ে তিনি চেতনা-কুসুম ফুটিয়েছেন, তা হয়তো কোনদিন জানা যাবে না। কিন্তু অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়। এ প্রভাব মন্থর বটে, কিন্তু অমোঘ।[৩১]

এ বক্তব্য কেবল আবদুল ওদুদ সম্পর্কে নয়, সামগ্রিকভাবে শিখা গোষ্ঠী সম্পর্কেই প্রযোজ্য হতে পারে।

সচেতন পাঠক লক্ষ্য করবেন যে এসব বক্তব্যে আহমদ শরীফ স্ববিরোধিতার শিকার হয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি তেমন সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। এর কারণ কি তার এই বিশ্বাস যে কমিউনিস্ট বা সোসিয়েলিস্ট কিংবা নাস্তিক না হলে মানুষ 'নির্মোহ উদার নির্বিশেষ মানুষ, সমাজ ও মতবাদী হতে পারেই না'[৩২] এবং সে কারণে অকমিউনিস্ট লোকদের দ্বারা সমাজ-রাষ্ট্র মানুষের কোন কল্যাণসাধন হতে পারে না? একথা সত্য যে সাহিত্য সমাজের লোকদের মধ্যে একমাত্র আবুল হুসেন ছাড়া আর কেউ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দিক সম্পর্কে তেমন ভাবেননি; ভাবলে আরো ভাল হতো নিশ্চয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও যা তারা করতে চেয়েছিলেন তার মূল্যও নগণ্য নয়।

আহমদ শরীফ আরো মন্তব্য করেছেন শিখা গোষ্ঠীর জীবন দৃষ্টি ও বাণী মানুষের বিজ্ঞানবুদ্ধি প্রসারের দরুন একালে অনুকূল নয়। তাই একালের মানুষ তা পছন্দ করে না পণ্ডশ্রম বলে আর ষাটোত্তর বাংলায় তা হয়ে পড়েছে অপ্রয়োজনীয়।[৩৩] আহমদ শরীফ যখন এসব কথা লেখেন তখন তিনি তার স্বদেশের মানুষের গড় মনোভঙ্গি সম্পর্কে সচেতন থেকে এসব মন্তব্য করেছেন বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানবুদ্ধি তথা যুক্তিনিষ্ঠতার প্রসার এদেশে কতটুকু ঘটেছে? আর ষাটোত্তর বাংলার সমাজ-মানসে এমন কী কী লক্ষণ তিনি দেখেছিলেন যার ভিত্তিতে শিখা গোষ্ঠীর চিন্তা ও কর্মধারাকে অপ্রয়োজনীয় মন্তব্য করেছিলেন তার কোন পরিচয় তিনি দেননি। অথচ তা দেয়া যে আবশ্যিক ছিল সেকথা নিশ্চয় সকলে স্বীকার করবেন। এদেশে 'যুক্তির যুগ' বলে কোন যুগ প্রকৃতপক্ষে আসেনি। তবুও, সমাজ ও দেশের প্রকৃত কল্যাণকামীরা হয়তো স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবে না যে, আবদুল ওদুদরা তাদের সময়ে যেসব কথা বলতে পেরেছিলেন আজকের বাংলাদেশে সে জাতীয় কথা বলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন ব্যক্তি বা সংগঠন যদি সে সব কথা বলার চেষ্টা করেন তবে তাদের পরিণাম শিখা গোষ্ঠীর চেয়ে ভয়াবহই হবে।

আমাদের বিশ্বাস এই অবস্থার জন্য প্রধান দায়ী দেশের মূলধারার রাজনীতি ও তাদের পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থা। যে এক উদ্দীপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এদেশের মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিল তার সর্বব্যাপী অচরিতার্থতা মানুষকে অমারাত্রির অন্ধকারের মতো গভীর হতাশায় নিমজ্জিত করেছে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশে এই অবস্থার স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণামই ঘটতে দেখা যাচ্ছে আজ। এ কালের মুসলিম চিন্তাবিদ আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ারের এই বিশ্লেষণ অনস্বীকার্য যে, "...

এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশসমূহে সেখানে পশ্চাৎপদতা আর দারিদ্র্য ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে ধর্মের আবেগাশ্রিত এক আদল পুনরুত্থিত হতে দেখা যায়। ধর্ম এসব ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত শূন্যতাবোধ এবং নাগরিক জীবনের টানাপোড়েনে বিভিন্ন রকম টেনশনের সঙ্গে লড়াইয়ের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে যেন।"[৩৪]

বাংলাদেশেও তাই ধর্মের পুনরুত্থান ঘটছে, মানুষ অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে অপৌরুষের শক্তির প্রতি যা তাকে অনেকখানি অদৃষ্টবাদী করে তুলছে, জীবন ও জগৎ অনেকের কাছে পরিগণিত হচ্ছে 'মায়া' বলে, আর এ সবকিছুর জন্য কাজ করে চলেছে নানা কিসিমের সংগঠনশক্তি। এ অবস্থায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের চিন্তা-দর্শন আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চৈতনিক পরিচর্যায় সহায়তা করতে পারে। পুরনো তার স্বকালে যা দেবার তা দিয়ে এখন রিক্ত— আহমদ শরীফের এ বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত নই।[৩৫] আমাদের বিশ্বাস নবনির্মাণে পুরনোরও ভূমিকা থাকে, যদি সে ভূমিকা পালনের মতো উপাদান তার মধ্যে থেকে থাকে। শিখা গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৬-৫৬) এই ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন যে বাঙালি মুসলমান সমাজে যদি কখনো সত্যিকারের রেনেসাঁস ঘটে তবে উপলব্ধ হবে যে তার প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করেছিল মুসলিম সাহিত্য সমাজ।[৩৬] এই মন্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ নেই বলে আমাদের বিশ্বাস।

তথ্যনির্দেশ

১. 'রেনেসাঁস : গোড়ার কথা ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী', *সংস্কৃতি-কথা*, বাংলা একাডেমী, ১৯৭০, পৃ. ৬৯

২. 'ঢাকার "মুসলিম সাহিত্য সমাজ"' *সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ*, মুক্তধারা, দ্বি-স ১৯৭৬,পৃ. ১২৭-২৮

৩. ঐ, পৃ.. ১২৫-২৬

৪. 'Education and culture in Dacca during the last hundred years', *Muhammad Shahidullah Felicitation Volume*, edt. by Muhammad Enamul Hoq, Asiatic Society of pakistan, Dacca, 1966, P.38

৫. উদ্ধৃত, আবদুল কাদির, 'তরুণ পত্র', পরিশিষ্ট, আবদুল কাদির সম্পাদিত *আবুল হুসেন রচনাবলী* (১ম খণ্ড), নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৮, পৃ. ৪২০

৬. আনিসুজ্জামান, 'কাজী আবদুল ওদুদ', সাঈদ-উর রহমান সম্পাদিত ওদুদ-চর্চা, একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৮২, পৃ. ১৫৮

৭. 'একখানি পত্র', *মাসিক সঞ্চয়,* পৌষ ১৩৩৬, পৃ. ১৪৮

৮. প্রথম প্রবন্ধ, *যুগ-যন্ত্রণা,* কথাকলি, ১৯৭৪, পৃ. ৯২

৯. ঐ, পৃ. ৯১

১০. আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার, 'ইসলাম, উদারনীতি ও গণতন্ত্র', *ইসলাম ও আধুনিকতা,* প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্স্ প্রা. লি. কর্তৃক অনূদিত ও প্রকাশিত, কোলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ২৮

১১. *কাজী আবদুল ওদুদের পত্রাবলী,* আবুল আহসান চৌধুরী সংকলিত ও সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯, পৃ. ৫৪

১২. আহমদ নূরুল ইসলাম, 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (কার্যবিবরণী), পাণ্ডুলিপি, ১৬শ খণ্ড, ১৯৯৫, পৃ. ১৫৯

১৩. প্রথম প্রবন্ধ, পৃ. ৯৩

১৪. তৃতীয় প্রবন্ধ, সময় সমাজ মানুষ, বিদ্যা প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃ. ১০৫

১৫. ঐ, পৃ. ১০৫। রামমোহনের ধর্মমত সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন, "রামমোহন ধার্মিক ছিলেন না, আস্তিক্যও তাঁর দৃঢ়প্রত্যয়ভিত্তিক ছিল না, সর্বসংস্কার তিনি পরিধেয় বস্ত্রের মতো কিংবা দেহের ধুলোর মতো পরিহার করতে পেরেছিলেন। নীতি-নিষ্ঠ অধ্যাত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু মোক্ষকামী সন্তের আগ্রহ নিয়ে তিনি ব্রহ্মবাদ আবিষ্কার ও বরণ করেননি, ম্লেচ্ছ কোম্পানীর সমাজ পরিত্যক্ত চাকুরে ও উচ্ছৃঙ্খল এজুদের সমাজশ্রয়ী করবার জন্যে পরার্থপরতা কিংবা লোক-হিতৈষণা বশেই তিনি বুদ্ধি করে ব্রহ্মবাদের চাল চেলেছিলেন।" (প্রথম প্রবন্ধ, পৃ. ৯৫) এই বক্তব্যে শুধু যে বিবর্তকের অবকাশ আছে তাই নয়, স্বয়ং আহমদ শরীফই এর উল্টো কথাও বলেছেন। রামমোহন সম্পর্কে আরো স্ববিরোধী মত আমাদের আলোচনাভুক্ত প্রথম ও তৃতীয় প্রবন্ধেই পাওয়া যাবে।

১৬. প্রথম প্রবন্ধ, পৃ. ৯৩

১৭. ঐ, পৃ. ৯৫

১৮. ঐ, পৃ. ৯৩ ও তৃতীয় প্রবন্ধ, পৃ. ১০৫-০৬

১৯. প্রথম প্রবন্ধ, পৃ. ৯৭

২০. তৃতীয় প্রবন্ধ, পৃ. ১০৮

২১. দ্বিতীয় প্রবন্ধ, পৃ. ৯৯। আহমদ শরীফ একবার বলেছেন প্রবন্ধটি পঠিত হয়েছিল সাহিত্য সমাজের তৃতীয় সাধারণ অধিবেশনে (কোন বর্ষের তা বলেননি), কিছু পরে আবার বলেছেন বার্ষিক অধিবেশনে (এবারও বর্ষের উল্লেখ করেননি)। একই রচনায় স্বল্প ব্যবধানে এই তথ্য-বিভ্রান্তি–তাও আংশিক ও ভুল তথ্য আহমদ শরীফের মতো লেখকের কাছে প্রত্যাশিত নয়। প্রকৃত তথ্য এই যে প্রবন্ধটি পড়া হয়েছিল প্রথম বর্ষের পঞ্চম অধিবেশনে।

২২. 'আগুন নয় আলো', *ওদুদ-চর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫-৩৬

২৩. তৃতীয় প্রবন্ধ, পৃ. ১০৭

২৪. আবদুল ওদুদ, 'সম্মোহিত মুসলমান', *শাশ্বত বঙ্গ*, ব্র্যাক প্রকাশনা, ১৯৮৩, পৃ. ৩৯৯

২৫. প্রথম প্রবন্ধ, পৃ. ৯৭

২৬. ঐ, পৃ. ৯৩

২৭. ঐ, পৃ. ৯২

২৮. দ্বিতীয় প্রবন্ধ, পৃ. ১০৪, তৃতীয় প্রবন্ধ, পৃ. ১০৯

২৯. 'সাহিত্য সাধক আবদুল হক', *লোকায়ত*, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, পৃ. ১০

৩০. ঐ, পৃ. ১৩

৩১. প্রথম প্রবন্ধ, পৃ. ৯৮-৯৯

৩২. দ্বিতীয় প্রবন্ধ, পৃ. ১০১

৩৩. প্রথম প্রবন্ধ, পৃ. ৯২ ও ৯৮

৩৪. 'ইসলাম, উদারনীতি ও গণতন্ত্র', *ইসলাম ও আধুনিকতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৩৫. প্রথম প্রবন্ধ, পৃ. ৯৪

৩৬. 'রেনেসাঁস ঃ গোড়ার কথা ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯